ভারতে পেশাগত কর্মনিযুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

ভারতে ১৯০১ সালে মোট কর্মক্ষম মানুষের প্রায় ৭২ শতাংশ নিযুক্ত ছিলেন কৃষি, গোপালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ ইত্যাদি অর্থাৎ প্রাইমারি ক্ষেত্রে। একই সময়ে কল-কারখানা, নির্মাণশিল্প, খনি ও খনিজ শিল্প অর্থাৎ সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিলেন মোট কর্মক্ষমদের প্রায় ১৩ শতাংশ। ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, যোগাযোগ, অন্যান্য সেবাক্ষেত্র ইত্যাদিতে অর্থাৎ টারশিয়ারি ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিলেন প্রায় ১৬ শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ। এরপর পঞ্চাশ বছর ধরে এই চিত্রটিতে পরিবর্তন দেখা যায় না বললেই চলে। ১৯৫১ সালে প্রাইমারি সেকটরে নিযুক্ত ছিলেন ওই ৭২ শতাংশ মানুষ। সেকেন্ডারি সেকটরে কর্মনিযুক্তি কিছু হ্রাস পেয়ে হয় ১১ শতাংশ। টারশিয়ারি সেকটরে কিছু বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৭ শতাংশ। এই পরিবর্তনহীনতার কারণ হল পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সরকার ভারতের দীর্ঘকালীন উন্নয়নের বিষয়ে আগ্রহী ছিল না। প্রাইমারি সেকটর বা কৃষিজাত কাঁচামালেই তারা বেশি আগ্রহী ছিল। এই কাঁচামাল ব্রিটেনে চালান হত এবং তাই দিয়ে তৈরি শিল্পজাত পণ্য বেশিরভাগই আবার ব্রিটেন থেকে ভারতে আমদানি হত। ভারতে শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা ব্রিটিশদের ছিল না।

এই পরিকল্পনার সূত্রপাত হয় স্বাধীনতার পর। কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পরবর্তী দশকগুলিতে শিল্প প্রভৃতি সেকেন্ডারি সেকটর এবং বাণিজ্য ও সেবা প্রভৃতি টারশিয়ারি সেকটরে প্রভূত বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে কৃষি তথা প্রাইমারি সেকটরের উপর নির্ভরতা বিশেষ কমেনি। ১৯৮১ সালে দেখা যাচ্ছে প্রাইমারি সেকটরে নিযুক্ত মোট কর্মীসংখ্যার প্রায় ৬৯ শতাংশ, সেকেন্ডারি সেকটরে প্রায় ১৩ শতাংশ এবং টারশিয়ারি সেকটরে প্রায় ১৮ শতাংশ। ১৯৯১ সাল অবধি প্রায় একই গতিপ্রকৃতি চোখে পড়ে। কেবলমাত্র টারশিয়ারি সেকটরে কর্মনিযুক্তি বৃদ্ধির ধারাটি দেখা যায় ঊর্ধ্বগামী। প্রাইমারি সেকটরে কর্মনিযুক্তির হার না কমার কারণ হল কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি না পাওয়া এবং সাধারণ কৃষিকর্মীর হাতে উদ্বৃত্ত তৈরি না হওয়া। এই কারণে বেশিরভাগ মানুষই ভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে সেকেন্ডারি সেকটর অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে পারেননি। পাশাপাশি আরও একটি কারণও দেখা যায়। কৃষিক্ষেত্র মূলত শ্রমনিবিড়ই রয়ে গেছে,

কিন্তু, শিল্পক্ষেত্র দ্রুত পুঁজিনিবিড় হতে থেকেছে। অর্থাৎ, শিল্পক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে নতুন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়নি। ফলে, কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রমিকেরা শিল্পক্ষেত্রে জায়গা পাননি। অর্থাৎ, উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে দেখা দিতে থেকেছে বৈষম্য। এই বৈষম্যের কারণেই বাড়তে থেকেছে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে আয়ের বৈষ্যম্য।

১৯৯১ সালের পর থেকে পরিস্থিতি সামান্য বদলাতে শুরু করে। ২০০০ সালে দেখা যায় প্রাইমারি সেকটরে কর্মনিযুক্তির হার দাঁড়িয়েছে ৫৭ শতাংশ, সেকেন্ডারি সেকটরে ১৭ শতাংশ এবং টারশিয়ারি সেকটরে প্রায় ২৬ শতাংশ। এর কারণ মূলত বিশ্বায়নের ফলে টারশিয়ারি সেকটরের সেবা ও সেকেন্ডারি সেকটরের শিল্পক্ষেত্রের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি। টারশিয়ারি সেকটরে তথ্যপ্রযুক্তি ও পর্যটন, পরিবহন ও হোটেল ব্যবসায় কর্মসংস্থান ও কর্মে নিয়োগ বেড়েছে। তবুও, এই পরিবর্তনকে সার্বিক অর্থে জোরালো বলা যায় না। কারণ, এই পরিবর্তন দেশের মূল কাঠামো অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। যে দেশে প্রায় ষাট শতাংশ মানুষ কাজের জন্য আজও নির্ভর করেন কৃষির উপরে সেই দেশের উন্নয়নকে জনমুখী কিংবা সুদূরপ্রসারী বলা যায় না। তাছাড়া, এর পাশাপাশি দেখা যায় কৃষিক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বেড়েছে অর্থাৎ, বড় চাষীদের হাতে জমির পরিমাণ ঘনীভূত হয়েছে। অর্থাৎ, সাম্প্রতিক কালে সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি সেকটর মিলিয়ে প্রায় ৪৩ শতাংশ কর্মনিযুক্তির ব্যবস্থা হলেও, তা প্রাইমারি তথা মূলত কৃষিক্ষেত্রের পরিস্থিতি পরিবর্তনে সক্ষম তো হয়ইনি বরং সেখানে বৈষম্য বাড়িয়েছে। নিম্নে টেবিলে সংক্ষিপ্ত রাশিতথ্য দেওয়া হল –

ভারতে কর্মনিযুক্তি বিন্যাস (শতাংশ)

ক্ষেত্র/বৎসর	১৯০১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০০
প্রাইমারি	৭১.৮	৭২.১	৭১.৮	৭২.১	৬৮.৮	৬৬.৮	৫৬.৭
সেকেন্ডারি	১২.৬	১০.৬	১২.২	১১.২	১৩.৫	১২.৭	১৭.৫
টারশিয়ারি	১৫.৬	১৭.৩	১৬.০	১৬.৭	১৭.৭	২০.৫	২৫.৮
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

ভারতে কর্মনিযুক্তি বিন্যাস পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাগুলি কী? / ভারতে কর্মনিযুক্তি বিন্যাস বহুলাংশে অপরিবর্তিত থাকার কারণ কী?

১) ভারতে নীতিপ্রণয়নকারী ও পরিকল্পনার কর্তারা কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হননি। ষাটের দশকের নূতন কৃষি কৌশল যা সবুজ বিপ্লব নামে পরিচিত তা আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে প্রমাণিত। এই সবুজ বিপ্লবের ফলে দেশজ শস্যবীজগুলি লুপ্ত হয়েছে। আঞ্চলিক কৃষি-বৈষম্য এবং আয়-বৈষম্য দেখা দিয়েছে। বড় জোতদারদের হাতে ভূমি ঘনীভূত হয়েছে। দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বেড়েছে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর হ্রাস পেয়েছে। আজ প্রমাণিত যে, কৃষিনীতির ক্ষেত্রে দেশজ বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রাখা হয়নি এবং তাকে মানাও হয়নি। বিদেশি নীতি যা বিদেশে হয়তো প্রযোজ্য তাকে জোর করে চাপানো হয়েছে এদেশে। উপরন্তু, শিল্পক্ষেত্রে নতুন পুঁজি ও যন্ত্রভিত্তিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়েনি। ফলে, কৃষি মূলত শ্রমনিবিড় থেকে গিয়েছে এবং সেখানে ভূমিহীন কৃষক ও দিনমজুরের সংখ্যা বাড়লেও তাদের জন্য শিল্পে কর্মসংস্থান ঘটেনি। তারা কৃষিনির্ভরই থেকে গিয়েছে।

২) ভারতে ভূমিসংস্কার নীতি বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বড় জোতদারেরা বেনামে জমি রেখে দিয়েছেন। উদ্বৃত্ত জমির চিহ্নিতকরণ ঘটেনি এবং ফলত তা ভূমিহীন বা প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বণ্টিত হয়নি। পূর্ব ভারত বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ব্যাপক হলেও, ভাগচাষী, বর্গাদার এবং পাট্টাপ্রাপ্ত ভূমিহীন মানুষেরা অনেকেই সেই জমি ধরে রাখতে পারেননি। দারিদ্রের কারণে বড় জমির মালিকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। পরিণত হয়েছেন সেই ভূমিহীন দিনমজুরে।

৩) পুঁজি কম এবং নিরাপত্তাহীনতা বেশি হওয়ায় গ্রামীণ ও কৃষিঋণের সুবিধেগুলি ছোট প্রায় নিরক্ষর অশিক্ষিত চাষীরা পাননি। সার ও কীটনাশকে সরকারি ভর্তুকির সুফলও তেমন পাননি। এগুলির সুযোগ নিয়েছেন বেশি করে বড় চাষীরা। বড় চাষীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হার মেনেছেন ছোট চাষীরা। লোকসান গুনে অনেকেই জমি বিক্রি করে দিয়েছেন। অথচ, শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থান জোটেনি। কৃষিক্ষেত্রেই সস্তায় দিনমজুরের জোগান বেড়েছে।

৪) একশো দিনের কাজের প্রকল্প ও অন্যান্য দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পগুলি গরিবের হাতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে, গরিব পরিবারে পরবর্তী প্রজন্ম ভিন্ন দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করতে

পারেননি। তাঁরাও বেশিরভাগই কৃষির উপরেই নির্ভরশীল থেকেছেন। এছাড়া, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকেছে গতানুগতিক ডিগ্রি প্রদানকারী। কার্যকরী দক্ষতাপ্রদানকারী শিক্ষার প্রসার তেমন ঘটেনি।

৫) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বিভিন্ন সরকারি নিয়ন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে লাভবান হয়েছে মূলত পুঁজিনিবিড় বড় শিল্প। শ্রমনিবিড় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য বাস্তবে তেমন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বেসরকারি সংগঠিত শিল্পক্ষেত্র লাভবান হয়েছে যদিও সেখানে কর্মসংস্থান অতি সামান্য। অসংগঠিত ক্ষেত্র পরিকল্পনার সুফল পায়নি এবং পিছিয়ে পড়েছে যদিও এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সবচেয়ে বেশি।

৬) জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। কর্মসংস্থান সেই হারে না বাড়ার ফলে বেড়েছে বেকারত্ব। এদের একটা বড় অংশ নিয়োজিত হয়েছে কৃষিক্ষেত্রে। এই নিয়োগের অনেকটাই আসলে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব অর্থাৎ এরা কৃষিক্ষেত্রে কাজ না করলেও কৃষি উৎপাদন কমবে না।

উপরোক্ত কারণগুলি ভারতে কর্মনিযুক্তি বিন্যাসে প্রয়োজনের তুলনায় কম পরিবর্তন বা, প্রায় পরিবর্তনহীনতার জন্য দায়ী। ভারতের অর্থনৈতিক নীতিপ্রণয়নকারীদের উচিত শ্রমনিবিড় ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পকে সাহায্য করা। এর ব্যতিক্রম যত এবং যতদিন হতে থাকবে, কর্মনিযুক্তি বিন্যাস এবং আয়ের বৈষম্য তত এবং ততদিন ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে।